নগর বাসযোগ্য করতে জেলা পর্যায়ে কর্মসংস্থান দরকার

মোতাহার হোসেন

রাজধানী ঢাকা বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল নগরীর অন্যমত। আধুনিক নগর ব্যবস্থায় যে সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার তার অনেকটাই অনুপস্থিত এখানে। মূলত;শিক্ষা,স্বাস্থ্য,অধিকাংশ অফিস,আদালত, কর্মসংস্থানসহ মানুষের অপরিহার্য্য প্রায় সব সেমবা ও সুযোগের ব্যবস্থা ঢাকা কেন্দ্রিক হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ প্রতিনিয়ত রাজধানী মুখী হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপ সেবা ও সুযোগের আশায় মানুষ ঠাঁই নিচ্ছে শহর ছেড়ে নিকটস্থ বিভাগীয় ও জেলা শহরেও। একই সঙ্গে নগরায়নের ফলে দেশের অন্যান্য নগরগুলোতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। নগরায়ণও হচ্ছে দ্রুতগতিতে। সেই সঙ্গে নগরীতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিবিধ সমস্যা। গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট,যানবাহন সংকট, জলাবদ্ধতা, দূষণ ও যানজট ,জলজট.মানব জটের পাশাপাশি নতুন নতুন অসংখ্য সংকট নগরবাসীর ঘাড়ে চেপে বসছে। এর বিপরীতে নগরীর বাসযোগ্যতা রক্ষার জন্য যেসব পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে, তা সময় উপযোগী নয়, আবার তা বাস্তবায়নেও রয়েছে দীর্ঘসূত্রিতা। ফলে নগরগুলো দিন দিন আরও বাসযোগ্যহীন হয়ে পড়ছে। নগরীর এই ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিরসনে ঢাকাকে বৃত্তাকার সড়ক,নৌ,রেল যোগাযোগের আওতায় আনা, রাজধানীর নিকটস্থ জেলা,উপজেলায় পরিকল্পিত উন্নয়ন,শিক্ষা,স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থান,অফিস,আদালত স্থানান্তর ও নতুন করে গড়ে তোলা, দেশের জেলা শহরগুলোকে হাব হিসেবে ধরে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জেলা পর্যায়েই তৈরি করতে হবে কর্মসংস্থান। জেলার সঙ্গে গ্রামকে যুক্ত করে সুষম উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। টেকসই ও বাসযোগ্য নগরায়ণে এ সবের বিকল্প নেই।

নগরীকে বাসযোগ্য করার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে সরকারি,বেসমরকারি বিভিন্ন সংস্থা প্রায়শই নানান উদ্যোগ আয়োজন করে থাকে। ঠিক এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি‘স্থায়িত্বশীল নগরায়ণ: সমস্যা ও সমাধান’ শীর্ষক এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতেও প্রায় অভিন্ন এমন অভিমত উঠে এসেছে। ঐ অনুষ্ঠানে সিপিডির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান এর পরামর্শ , অতি নগরায়ণের ফলে যানজট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নগরায়ণের ঝুঁকি বাড়ছে। সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত নগরায়ণ সম্প্রসারিত হচ্ছে। আবাসন কোম্পানিগুলোর চটকদার বিজ্ঞাপনের ফলে মানুষ হমড়ি খেয়ে পড়ছে। সেখানেও নাগরিক সুবিধার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, বিএনপির আব্দুস সালাম তালুকদার স্থানীয় সরকারমন্ত্রী থাকার সময় সিপিডির পক্ষ থেকে দেশের চারটি শহরের মেয়রকে নিয়ে বসা হয়। উদ্দেশ্য ছিল দেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলোকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়। তখন আমলাতন্ত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘সেখানে মেয়রের হাতে পুলিশ থেকে শুরু কওে শহরের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ঢাকায় তা নেই। বঙ্গবন্ধুর আমলে একটি পরিকল্পনা কমিশন ছিল। আমলাতন্ত্রের কারণে সেটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৩০০ সিসির টয়োটা গাড়ি ব্যবহার করতেন। এখন ঢাকা শহরে মানুষ মার্সিডিজ বেঞ্জ-বিএমডব্লিউতে চড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শহরটা ন্যাস্তি (নোংরা) হয়ে গেছে।’

নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলামের অভিমত, শহরে দিন দিন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু নগর উন্নয়নের দায়িত্বে কোনো একজন সুনির্দিষ্ট মন্ত্রী নেই। যে দেশের ৩৬ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে সেখানে একজন নগর বিষয়কমন্ত্রী থাকা প্রয়োজন। আগামী ডেল্টা প্ল্যানে শহরের লোকসংখ্যা আরও বাড়বে। তিনি বলেন. দেশে নগরায়ণ বাড়ছে। ১৯৭৪ সালে দেশে নগরায়ণের হার ছিল মাত্র ৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ১৯৮১ সালে হয় ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ২০ দশমিক ১৫ শতাংশ, ২০০১ সালে ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ, ২০১২ সালে ৩১ শতাংশ এবং ২০২২ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯ দশমিক ৭১ শতাংশে। নগরায়ণের ক্ষেত্রে ঢাকা বিভাগ সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সিলেট বিভাগ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ১৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এসব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে একগুচ্ছ সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

‘নগরায়ণ ও দুর্যোগ : ভূমিকম্প ও অগ্নি কান্ডের অভিঘাত’ প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল বলেন, যত বেশি নগরায়ণ হবে তত বেশি বিপদ ডেকে আনা হবে। বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই। ভূমিকম্পের দিক থেকে দেশের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঝুঁকিতে থাকলেও আশার কথা হলো, নিকট ভবিষ্যতে বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ লেলিন চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশে ওয়ান হেলথ বা অভিন্ন স্বাস্থ্যের ধারণা প্রয়োগের জন্য আইনি কাঠামো নেই। আগামীতে মানুষের সুস্থতা নির্ভর করবে অভিন্ন স্বাস্থ্য ধারণা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। অভিন্ন স্বাস্থ্যের একটি প্রায়োগিক ধারণা প্রস্তুত করা দরকার।

একজন পরিবেশবিদ বলেন, বাসযোগ্য নগরীতে ১২ শতাংশ উন্মুক্ত স্থান ও ১৫ শতাংশ এলাকায় সবুজের আচ্ছাদন থাকার কথা কিন্তু আছে সামান্য। ঢাকা শহরের সঙ্গে যুক্ত আটটি নদী ঘিরে সার্কুলার নৌপথ চালু করতে না পারাটা আমাদের ব্যর্থতা। যানজটের ভারেও ন্যুব্জ হয়ে আছে ঢাকা। গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শামসুল হকের অভিমত, যানজট নিরসন করতে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ করার কাজও প্রথম ধাপে রয়েছে। এটাকে সামনের দিকে নিতে না পারলে কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা কোনোভাবেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। জনঘনত্ব ও শহরের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এলাকাভিত্তিক জনঘনত্বের ম্যাপ তৈরি

করা। এলাকাভিত্তিক সামাজিক ও নাগরিক সুবিধা ও অবকাঠামোর তালিকা প্রস্তুত করা। সেই অনুযায়ী উন্নয়ন অনুমোদন দেয়া। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং সামগ্রিক টেকসই শহরের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রসঙ্গত: ঢাকা মাঝে মাঝেই বায়ুদূষণে বিশ্বে শীর্ষস্থান করে নেয়। বায়ুদূষণের কারণে বিশ্বের সব মানুষের গড় আয়ু কমছে দুই বছর চার মাস। তবে বাংলাদেশে কমছে ছয় বছর আট মাস। এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, গত ৩৩ বছওে রাজধানীতে থেকে বিলুপ্ত অথবা উধাও হয়েছে ১৯০০ পুকুর। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দখলদারিত্বও বিপুল পরিমাণ আবাসন চাহিদার কারণে ১৯৮৫ সাল থেকে এই পর্যন্ত গত ৩৩ বছরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঢাকার এক হাজার ৯০০ সরকারি-বেসরকারি পুকুর ও জলাধার। এসব পুকুরের মোট জমির পরিমাণ ৭০ হাজার হেক্টর। এই পুকুরগুলো একসময় ছিল পানি ধরে রাখার অন্যতম মাধ্যম। ফলে জলাবদ্ধতা নিরসন,অগ্নি নির্বাপন,পানীয় জলের সংকট নিরসনে এগুলোর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য বিভাগের পরিসংখ্যান মতে, ১৯৮৫ সালের দিকে ঢাকায় মোট পুকুর ছিল দুই হাজার। বেসরকারি হিসাবমতে, এ বছর পর্যন্ত তা এসে ঠেকেছে এক শতে। যদিও ঢাকায় পুকুরের প্রকৃত সংখ্যা কত সে হিসাব নেই দুই সিটি কর্পোরেশনের কাছে। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিংয়ের এক সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গত সাড়ে তিন দশকে হারিয়ে গেছে ঢাকার ১০ হাজার হেক্টরের বেশি জলাভূমি, খাল ও নিম্নাঞ্চল।

এ ভাবে জলাশয় ভরাটের এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৩১ সাল নাগাদ ঢাকায় জলাশয় ও নিম্নভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ১০ শতাংশের নিচে নেমে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৭৮ সালে ঢাকা ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় জলাভূমির পরিমাণ ছিল দুই হাজার ৯৫২ হেক্টর এবং নিম্নভূমি ১৩ হাজার ৫২৮ হেক্টর। একই সময়ে খাল ও নদী ছিল দুই হাজার ৯০০ হেক্টর। রাজধানীর বৃষ্টির পানি এসব খাল দিয়েই পড়েছে নদীতে। ২০১৪ সালে ঢাকা ও আশপাশে জলাভূমি কমে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৯৩৫ হেক্টর, নিম্নভূমি ছয় হাজার ১৯৮ হেক্টর এবং নদী-খাল এক হাজার দুই হেক্টর। অর্থাৎ ৩৫ বছরে জলাশয় কমেছে ৩৪.৪৫ শতাংশ। এ সময়ের ব্যবধানে নিম্নভূমি কমেছে ৫৪.১৮ এবং নদী-খাল ৬৫.৪৫ শতাংশ। ২০১৮ সালেও রাজধানীতে ১০০টি পুকুর জলাশয় ছিল। গেল পাঁচ বছরে নানান উন্নয়ন কাজের জন্য ভরাট হয়েছে একের পর এক পুকুর। কমতে কমতে তা এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯টিতে। যার ফলে রাজধানীতে কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পানির যোগান পেতে বেগ পেতে হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে। এ অবস্থায় জলাশয়গুলো রক্ষা করার তাগিদ সংশ্লিষ্ট মহলের। নগর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নগরে বড় বড় ভবন গড়ে উঠছে; কিন্তু এগুলো নির্মাণের পেছনে পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা নেই। ফলে পুকুর-খাল-বিল-জলাধার একের পর এক বিলীন হচ্ছে। জলাধার রক্ষায় আইন থাকলেও সেগুলো না মানায় একের পর এক ভরাট হয়ে সেখানে গড়ে উঠছে আবাসন। শুধু ঢাকা শহর নয়, ঢাকার বাইরেও পুকুরগুলো একের পর এক দখল হয়ে যাচ্ছে, ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী বসিলা, কেরানীগঞ্জ, আশুলিয়া, সাভার, টঙ্গীর এসব এলাকার পুকুরগুলোও হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ঢাকার ইতিহাস বলছে, একসময় ঢাকার খালগুলোর সঙ্গে আশপাশের চারটি নদীর মিলন ছিল। এখন এসবের অধিকাংশই বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের প্রধান নির্বাহী ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আতিক রহমানের অভিমত, 'সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে জলাভূমিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা শহরের ভেতরে একসময় বড় বড় জলাধার ছিল। সেগুলো ভরাট কিংবা দখল হয়ে গেছে। আগে অনেক পুকুর থাকলেও এখন তার অস্তিত্ব নেই। রাজধানীকে বাসযোগ্য করতে নগরীর পাশাপাশি শহরতলী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ এলাকায় পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। শব্দ ও বায়ুদূষণ রোধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রয়োনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দূষণমুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার ও সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে পয়:নিষ্কাশনে সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নগরীর নিচু এলাকার জলাবদ্ধতা ও পয়:নিষ্কাশন পরিকল্পিত সমাধান করা। ইটভাটা নির্মাণকাজ ও শিল্পকারখানার বায়ু দূষণের প্রধান উৎস চিহ্নিত করে দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসা। বায়ুদূষণ,শব্দ দূষণ,পরিবেশ দূষণ, পানি দূষণ রোধে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পরিবেশ ঝুঁকির বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা। নগরীতে খোলা জায়গা ও খেলার মাঠ নির্মাণে সরকারের বিনিয়োগ, ভাসমান ও বস্তিবাসীদের রাজধানীর বাইরে শহরতলী ও পাশ^বর্তী জেলায় কর্মসংস্থান.শিক্ষা,স্বাস্থ্য সেবা,যোগাযোগ,অফিস আদালত গড়ে তোলা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, যানজট নিরসনে ফুটপাত নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ, বাস রুটের যৌক্তিকীকরণ এবং শহরে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট,খেলার মাঠ,উন্মুক্ত জায়গা.পর্যাপ্ত জলাশয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি। এসব করা গেলে ঢাকা বাস যোগ্য হওয়ার পথ সুগম হবে।

#

লেখক: সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

পিআইডি ফিচার